**ভূমিকা:**

বাঙালি জাতির ভাগ্যাকাশে যেসকল নক্ষত্র কোন এককালে উদয় হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি যখন ভুগছে অস্তিত্ব সংকটে, তখনই বাঙালি জাতির পরিত্রাণের প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর।

বর্তমান দক্ষিণ এশিয়ার বুকে যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ মানচিত্রে জ্বলজ্বল করে, সেই রাষ্ট্রটির গঠনে সবথেকে বড় অবদান মুজিবুর রহমানের। সেজন্যই স্বাধীন বাংলাদেশ তাকে দিয়েছে জাতির জনকের সম্মান। শেখ মুজিব ছাড়া আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যেত না।

এই বছর বাংলাদেশের এই মহান রাষ্ট্রনায়কের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। মজিবুরের এই জন্মশতবর্ষে তার জীবন, জীবনচর্যা, বাঙালি জাতির উদ্ধারে তার ভূমিকাএবং একবিংশ শতাব্দীতে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদনের উপস্থাপনা।

**মুজিবের জন্ম পরিচিতি ও শৈশব কাল:**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই মার্চ অবিভক্ত ভারতবর্ষে বাংলা প্রদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। উক্ত এই গোপালগঞ্জ জেলাটি আদপে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। বঙ্গবন্ধুর পিতা ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান এবং মায়ের নাম সায়েরা বেগম।

মুজিবুরের পিতা শেখ লুৎফর সরকারি আদালতের এক বিশিষ্ট কর্মচারী রূপে কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া পরিচিত মহলে স্পষ্টভাষী হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন শেখ মুজিব। বাড়িতে পরিচিতরা তাকে ডাকতেন খোকা নামে। চারটি বোন এবং দুইজন ভাই নিয়ে ছিল শেখ মুজিবুরের সংসার। বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, সেজ বোন হেলেন, মেজ বোন আছিয়া বেগম, এবং তার ছোট বোন ছিলেন লাইলী।

বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাইয়ের নাম ছিল শেখ আবু নাসের। এইভাবে অতি সাধারণ একটি পরিবারে ভাই বোনের মধ্যে গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই তিনি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। বিদ্যালয় শিক্ষা কালীন সময়ে একাধিক খেলায় পুরস্কারও পেয়েছেন মুজিবুর।

**ছাত্রজীবন:**

মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবুর গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হন। এখানেই তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯২৯ সালে তিনি ভর্তি হন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। এরপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গোপালগঞ্জ মিশনারি হাইস্কুলে বঙ্গবন্ধু সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৪২ সালে নাগাদ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

তারপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ এবং এবং ১৯৪৭ সালে বি.এ পাস করেন। ওই বছর ভারত বিভাগের পর শেখ মুজিবুর আইন অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। তবে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এজন্য তিনি আইনের পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। যদিও ২০১০ সালে এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আইন বিভাগে স্থাপন করেছে বঙ্গবন্ধু চেয়ার।

**রাজনীতিতে মুজিব:**

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর জীবন কাহিনী অত্যন্ত বর্ণময়। তিনি তার জীবদ্দশায় ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশ মোট এই তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ভোগ করেছেন। রাজনীতিতে তার হাতে খড়ি হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময়।

তবে প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা শুরু করবার পর। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে তিনি ব্রিটিশ ভারত থেকে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরী সংক্রান্ত আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এরপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর মজিবুরের কর্মক্ষেত্র হয় ঢাকা।

সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হবার পরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এই প্রতিষ্ঠান তাকে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের মুখ থেকে থেকে ছাত্র নেতার আসনে উন্নীত করে। তার কিছুদিন পর তিনি মৌলানা ভাসানি প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগে যোগদান করে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

**স্বাধীনতা আন্দোলনে মুজিব:**

প্রতিনিয়ত শাসকের দমনমূলক নীতির দ্বারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে একাধিকবার শাসক বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে গ্রেফতার হয়েছেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দীর্ঘ টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে তিনি পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তার অতি অল্পক্ষণের মধ্যে শেষবারের জন্য গ্রেপ্তার হন।

তার পরদিনই রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক নিধন যজ্ঞ শুরু করে।

এমতাবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ও পুলিশ রেজিমেন্টে কর্মরত বাংলার সদস্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দান করে। এই পর্যায়ে মুজিবনগরে প্রতিস্ঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই মুক্তিবাহিনী এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ রূপে পরিচিত।

তারপর ওই বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সরকারের যোগদানের পর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর অবিলম্বে শেখ মুজিবুর করাচির কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকায় ফিরে আসেন এবং রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ৫লক্ষ মানুষের সামনে আবেগঘন বক্তৃতা দেন।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী:**

নবগঠিত রাষ্ট্রের পুননির্মাণ সংগ্রামে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী রূপে শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তি আন্দোলন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনরায় গড়ে তুলবার কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ সময় তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিস্তৃত পরিসরে জাতীয়করণ কর্মসূচি কার্যকর করা হয়। শরণার্থী পুনর্বাসন এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়।

**শাসন বিতর্কে মুজিব:**

সারা জীবন বাঙালি জাতির জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া মুজিবুরের শাসক চরিত্র কালিমা মুক্ত নয়। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই তার বিরুদ্ধে নানান অভাব অভিযোগ উঠতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের প্রথম দিকে গোটা দেশজুড়ে ব্যাপক জাতীয়করণ ও শ্রমিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রবর্তনের মতন প্রক্রিয়াগুলি অদক্ষতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি এবং দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে গোটা দেশজুড়ে অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হতে থাকে।

তাছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করার কারণে মুজিবের ওপর ইসলামপন্থী নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট হন। এর মধ্যেই এই অসন্তোষে নতুন মাত্রা যোগ করে ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী দেখা যাওয়া দুর্ভিক্ষের ঘটনা। এই সময়ে দ্রব্যমূল্যের অসামঞ্জস্যতা, স্বজনপোষণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা তথা ভারতের উপর সর্বক্ষেত্রে অধিক নির্ভরশীলতার কারণে শেখ মুজিবকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

এমন পরিস্থিতির সমাধানের জন্য মুজিবুর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের শাসনকাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে সারা জীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন। এর অব্যবহিত পরেই গোটা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং ব্যাপক দমনমূলক আইনের মাধ্যমে বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে মুজিবের প্রাক্তন সহকারি বন্ধুরাও মুজিববিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাতে লিপ্ত হন।

**মুজিবের আদর্শ এবং জীবনচর্যা:**

১৯৭৫ সালে নিজ দেশের রাজধানী ঢাকার কাছে ধানমন্ডিতে সেনা অভ্যুত্থানের দ্বারা শেখ মুজিবুরকে সপরিবারে হত্যা করা হলেও, তার জীবনের আদর্শগুলির কোনদিন মৃত্যু হতে পারে না। শেখ মুজিবুর বিশ্বাস করতেন ‘বাঁচো এবং বাঁচতে দাও’ নীতিতে। স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণের পর পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তার নীতি ছিল ‘কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয় সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব’।

এই নীতির দ্বারাই তিনি বিভিন্ন বিরোধী রাষ্ট্রের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন একটি পক্ষে অংশগ্রহণ না করে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাছাড়া রাজনৈতিক জীবনের সূচনা লগ্নে শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই সমাজতন্ত্র এবং মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব তার শাসন নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও মুজিবের জীবনচর্যা ছিল আর পাঁচটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতন। তিনিও সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী নেতার মতন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণায় বিশ্বাস করতেন।

**শতবর্ষে মুজিবের প্রাসঙ্গিকতা:**

বাংলাদেশের এই নক্ষত্রসম ব্যক্তিত্বটির জন্মশতবর্ষে তাকে নিয়ে এত আলোচনা হওয়ার প্রধান কারণ হলো জন্মের এক শতাব্দী পরেও জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মুজিবের আদর্শগত প্রাসঙ্গিকতা। মুজিব অনুসৃত প্রায় সকল নীতিগুলি এখনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সময় যত এগোচ্ছে বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন আদর্শের মিলন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা তত বেশি অনুভূত হচ্ছে। মুজিবুর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটানোর এই চেষ্টাই করেছিলেন।

আবার বাংলাদেশের পক্ষে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদানের প্রাসঙ্গিকতাও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আর অন্যদিকে সময় যত এগিয়ে চলেছে, বিশ্বজুড়ে মুজিব অনুসৃত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা ততই আদর্শ রাষ্ট্রনীতি বলে বিবেচিত হচ্ছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মৃত্যুর এতদিন পরেও শেখ মুজিবের দর্শনগুলির প্রাসঙ্গিকতা এখন তো কমে যায়ই নি, বরং সময়ের সাথে সাথে সেগুলি আরও গুরুত্ব লাভ করেছে।

**মুজিব শতবর্ষ পালন:**

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতার কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২০২০ সালের ১৭ ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালকে মুজিব শতবর্ষ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ৫০ বছরে পদার্পণ করবে।

এইসকল তাৎপর্যকে মাথায় রেখে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান কারিগর শেখ মুজিবুরের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে ইউনেস্কোর ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিব বর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই বর্ষ পালনের প্রেক্ষিতে দেশের তৃণমূল স্তর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা, স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রগতিতে তার অবদান ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের তরফে ব্যাপক প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

**উপসংহার:**

একথা সন্দেহাতীত যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে উপমা নিয়ে এক সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমৃত্যু বাঙালি তথা বাংলাদেশের হিতের কথা চিন্তা করে যাওয়া মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ তার শাসনকালে আদৌ সেই কাঙ্খিত সোনার বাংলা হয়ে উঠতে পেরেছিল কিনা তা বিচার্য নয়।

শাসনকালে গৃহীত নানা নীতির জন্য বিভিন্ন মহলে বঙ্গবন্ধু সমালোচিত হলেও আমাদের মনে রাখা দরকার সেই নীতিগুলি গৃহীত হয়েছিল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই। সেই কারণে জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই মুজিব শতবর্ষে আমাদের সকলের অঙ্গীকার হোক এই প্রিয় বাংলাদেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলা রূপে গড়ে তোলবার। একমাত্র তবেই এই দেশের মানুষের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের করুন আত্মবলিদান সার্থক হবে।